স্টপ ওভার থিংকিং

নিক ট্রেন্টন

ভাষান্তর : ত্বাইরান আবির

আষাঢ়

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বেশি চিন্তা মানেই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা নয় ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডি স্ট্রেস ফরমুলা এবং অন্যান্য ৩৩

তৃতীয় অধ্যায়

আপনার টাইম ম্যানেজ করুন ৫৯

চতুর্থ অধ্যায়

যেভাবে তৎক্ষণাৎ শান্তি পাবেন ৭৯

পঞ্চম অধ্যায়

পুনরায় নিজের চিন্তাভাবনার প্যাটার্ন সাজানো ৯১

ষষ্ঠ অধ্যায়

নতুন প্রতিস্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইমোশনাল রেগুলেশন ১১৫

STOP
OVER
THINKING
OVERTHINKING

প্রথম অধ্যায়

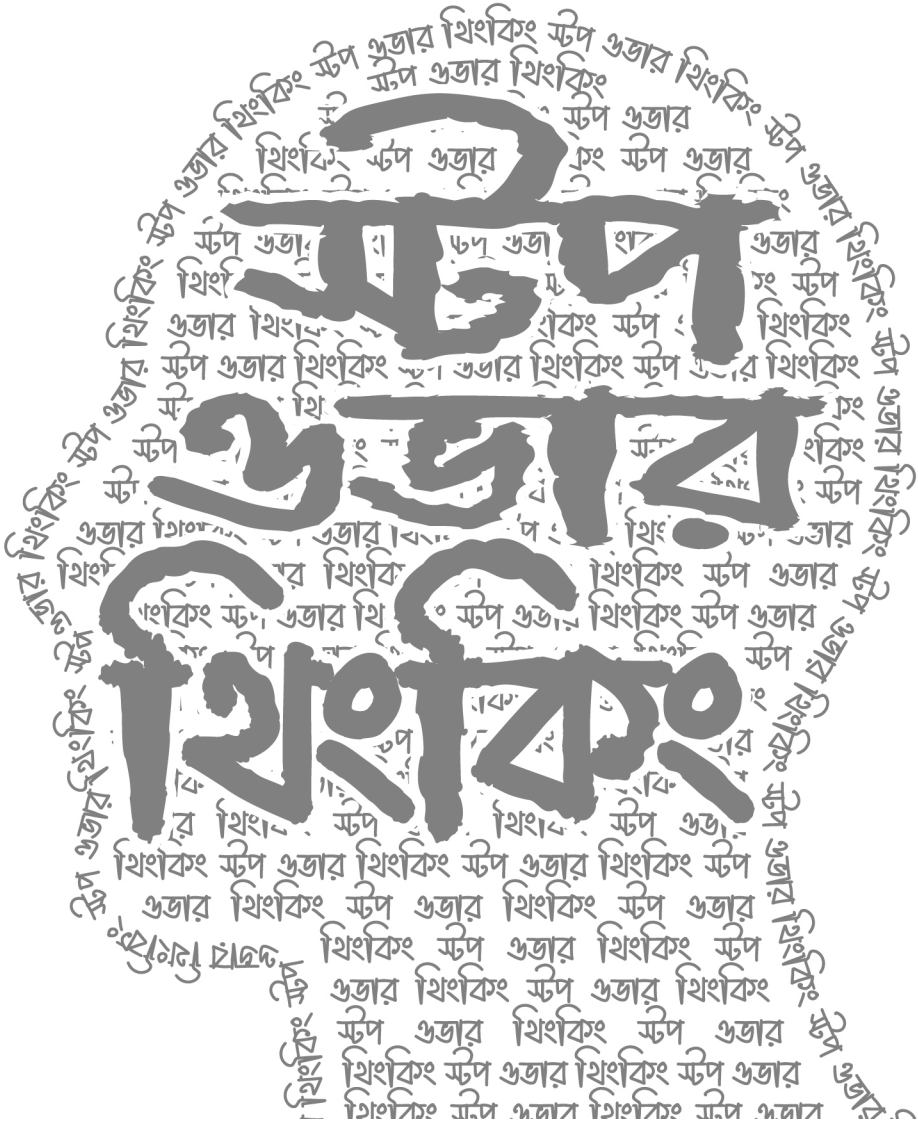
স্টপ
ওভার
থিংকিং

বেশি চিন্তা মানেই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা নয়

জেমস নামের একজন তরুণের কথাই ধরুন। জেমস বেশ ভালো একটা ছেলে। বুদ্ধিমান, দয়ালু ও আত্মসচেতন ব্যক্তি। নিজের ব্যাপারে একটু বেশিই আত্মসচেতন সে। তবে সে নানান বিষয় নিয়ে প্রায়শই দুশ্চিন্তা করে। এই যেমন আজকে সে তার একটি স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে। সমস্যাটি বড় নয়। তবে তার নজরে এসেছে। এটা নিয়েই তার মনে নানান চিন্তা তৈরি হয়ে গেল। অতঃপর যেই ভাবনা সেই কাজ। নিজের এই সমস্যাকে বড় মনে করে অনলাইনে ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করল জেমস। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলো খুব। এরপর সে হঠাৎ করেই থেমে গেল। ভাবল, আমি মনে হয় বিষয়টি নিয়ে বেশিই চিন্তাভাবনা করছি।

এবার সে নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করা বাদ দিলেও, স্বাস্থ্য নিয়ে যেসব চিন্তাভাবনা সে করছিল এতক্ষণ, সেসব নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করল। হয়তো তার কোনো থেরাপি দরকার। কিন্তু কোন ধরনের থেরাপি? জেমস নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে শুরু করল, নিজেকে ট্রায়ালে ফেলল, ডিফেন্ড করল, কাউন্সেলিং নিয়ে চিন্তাভাবনা করল। অসুস্থতা নিয়ে পূর্বের নানান স্মৃতি, অনুমান, ভয়, আতঙ্ক, আশঙ্কা সবই ধীরে ধীরে সে নিজের মনের মাঝে নিয়ে এলো। এরপর সে আবার থেমে ভাবল, এটাই কি তাহলে দুশ্চিন্তার স্বরূপ? এটা কি তবে প্যানিক অ্যাটাক? নাকি এটা সিজোফ্রেনিয়ার সমস্যা? ঠিক বুঝতে পারছি না।

তারপর সে চিন্তা করল, তার মতো করে ব্যথা আর কেউ কখনো পায়নি। আসলে, এই চিন্তা তার মাথায় আসার পরপরই অপরের সমালোচনার হাজারটা উদাহরণ তার সামনে চলে এলো। আর এটা তার দশা আরও খারাপ করতে শুরু করল। দিনের পর দিন মানুষের সমালোচনা, কটাক্ষের কথা মনে করে তার মন আরও খারাপ হয়ে গেল। এরপর সে হতভম্ব হয়ে ভেবে দেখল, যেসব ব্যাপার সে চাইলেই মন থেকে সরিয়ে দিতে পারে, সেগুলো নিয়ে সে কেন চিন্তা করছে। এসবের কোনো উত্তর পাওয়া হলো না জেমসের। আরও

একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, জেমসের দুশ্চিন্তার শুরুটা হয়েছিল ছোট একটি স্বাস্থ্যগত সমস্যা থেকে। অথচ নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তই সে নিতে পারেনি। উলটো তার মনের মাঝে নানান বাজে চিন্তার সমাহার ঘটেছে।

শুরুতে তার চিন্তা ছিল স্বাস্থ্য নিয়ে, স্বাস্থ্যগত নানান সমস্যা নিয়ে। কিন্তু এরপর সেটা মাথায় চলে গেল। তখন আর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা ছিল না। বরং স্বাস্থ্যগত নানান সমস্যা নিয়ে চিন্তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যেখান থেকে আদতে কোনো সমাধান পাওয়া সম্ভব ছিল না। এভাবে একে একে নেতিবাচক অনুভূতি, নেতিবাচক কথাবার্তা ধীরে ধীরে মনকে বিষিয়ে তোলে। জেমসের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল। এমনকি মনের ওপর দুশ্চিন্তা ঠিক কীভাবে প্রভাব ফেলে সবকিছু গ্রাস করতে থাকে, বেশিরভাগ সময়েই এসব জানা সম্ভব হয় না। অথবা বলতে পারেন, বেশিরভাগ মানুষই এসব জানতে পারে না। জানতে পারলে তাদের মুক্তি পাওয়া সহজ হতো। না জানার ফলেই হাজারটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

জেমস শুরুতে স্বাস্থ্যের দিকে তাকালেও, পরে তার তাকানোর জায়গা সঠিক ছিল না। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছিল। আমরা নিজেরাও একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল, গতিশীল ও বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে বসবাস করি। আমাদের দুশ্চিন্তার কেন্দ্রে অনেক সময় এগুলো প্রভাববিস্তার করে থাকে। দুশ্চিন্তা একজন মানুষের মনকে তখনই নেতিবাচকভাবে গ্রাস করতে সক্ষম হয়, যখন তার মাঝে সেসব চিন্তাভাবনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। একের পর এক জীবনের নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে করাতে কখন যে মানুষ দুশ্চিন্তার শিকার হয়ে যায়, সেই খেয়াল তার থাকে না। একসময় সে দুশ্চিন্তার শিকলে আটকে যায়, দাসত্ববরণ করে নেয়। আপনি হয়তো জানেন, আমাদের মস্তিষ্ক সবসময়ই প্রবলেম সলভিং প্রসেসের ভেতর দিয়ে যায়। মস্তিষ্কের সাহায্য নিয়ে আমরা নানান সমস্যার সমাধান করি। এটা ইতিবাচক একটি ব্যাপার। কিন্তু আপনি হয়তো এটা জানেন না, মস্তিষ্কের মাঝে দুশ্চিন্তা জায়গা করে নিলে এটা বিপরীত কাজ করতে থাকে। অর্থাৎ সমস্যা দূর করার বদলে উলটো বাড়াতে থাকে।

মস্তিষ্কের এই অবস্থাকে আপনি উদ্‌বেগ, দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ, অবসাদ বা নেতিবাচক স্মৃতি রোমন্থন যা-ই বলেন না কেন, এসবের ফলাফল ভয়াবহ। এগুলো কোনোভাবেই আপনার-আমার জীবনকে সামনে এগিয়ে যেতে দেয় না। উলটো বিপদে ফেলে। সচরাচর দুশ্চিন্তা সরলভাবে আপনার অল্পবিস্তর ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু একবার যদি চক্রাকারে এসব আপনার জীবনে চলে আসতে থাকে, তাহলে আজীবনের জন্য আপনার জীবন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। কেননা, দুশ্চিন্তার বিবিধ বিস্তার রয়েছে, যা একজন মানুষকে মরণব্যাধির পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম।

অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা হচ্ছে একটি ক্ষতিকর মেন্টাল অ্যাক্টিভিটি। এটা যেকোনো বিষয়ে অতিরিক্ত অ্যানালাইসিস, জাজমেন্টাল হওয়া, মনিটরিং, মূল্যায়ন বা কন্ট্রোল নেওয়ার মানসিকতা থেকে হতে পারে। যে আদলেই অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা আপনার মাঝে থাকুক না কেন, এর ক্ষতি সীমাহীন। রীতিমতো ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করে শেষ করতে পারবেন না আপনি।

আপনার অবস্থা যদি নিচের মতো হয়, তাহলে ধরে নেবেন, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা আপনার জন্য মারাত্মক একটি সমস্যা :

- আপনি সারাক্ষণই নিজের নানান চিন্তাভাবনার ব্যাপারে সচেতন থেকে সেসব নিয়ে ভাবতে থাকেন।
- আপনি বহুমাত্রিক চিন্তাভাবনায় ব্যস্ত থাকেন। অর্থাৎ, আপনি নিজের চিন্তাভাবনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন।
- আপনি সবসময়ই নিজের সকলপ্রকার চিন্তাভাবনার নিয়ন্ত্রণ নিতে চেষ্টা করেন।
- সবসময়ই অপ্রত্যাশিত নানান চিন্তাভাবনা আপনার মনকে বিষণ্ন করে রাখে। অন্যভাবে বললে, বিবিধ নেতিবাচক চিন্তাভাবনা মনে এনে নিজেকে কষ্ট দেন আপনি।
- নিজের বিষয়ে চিন্তাভাবনার ব্যাপারটিকে আপনার কাছে সংগ্রামের ও কষ্টকর মনে হয়।
- আপনি সবসময়ই নিজের চিন্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন, জাজ করেন এবং সন্দেহ করেন।

- যেকোনো জটিল পরিস্থিতিতে নিজের চিন্তাভাবনাকে ঠিকমতো কাজে না লাগিয়ে উলটো সমস্যাকে জোরালো করেন।
- সবসময়ই নিজের চিন্তাকে বোঝার জন্য গভীর থেকে আরও গভীরে নেমে নিজের সকল ভাবনা নিয়ে কল্পনার জগতে সময় কাটান।
- আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, যেকোনো চয়েজ ঠিকমতো করা সম্ভব হয় না আপনার পক্ষে, সবকিছু নিয়েই আপনার ভেতরে সন্দেহপ্রবণতা কাজ করতে থাকে।
- দিনের লম্বা সময় আপনি নানান বিষয়ে সচেতন থাকেন এবং চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সময় পার করেন।
- নিজেকে সবসময়ই আপনি নেতিবাচক থিংকিং প্যাটার্নের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। একবার-দুবার নয়, বারবার।
- একই চিন্তা আপনি বারবার করেন, বিশেষ করে অতীতের বিবিধ বিষয়ে, যেগুলোর বিরুদ্ধে এখন আপনার পক্ষে আর কিছুই করা সম্ভব নয়। তবুও আপনি এসব চিন্তা ছাড়তে পারেন না।

এই ধরনের ব্যাপারগুলো আপনি যদি নিজের মাঝে দেখতে পান, তাহলে নিশ্চিতভাবেই ধরে নিতে পারেন, অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা আপনাকে গ্রাস করে ফেলেছে। ভালোমতো খেয়াল করলে দেখবেন, ওপরে বেশ কিছু ভালো গুণও রয়েছে, যদি আপনি নিজের চিন্তাভাবনাকে সীমার মধ্যে রাখতে পারেন। স্থির থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচকভাবে চিন্তাভাবনা করার কাজটি বেশ উপকারী, তাই না? কিন্তু কয়জন আমরা এই কাজটি করতে পারি? পারি না। বেশিরভাগ মানুষই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তার দিকে ধাবিত হয়ে নিজের ক্ষতি করে ফেলে।

আপনি যখন নিজের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যান, আপনাকে কাজটি চিন্তার সাহায্য নিয়েই করতে হয়। তখন কোনো ক্ষতি হয় না। তাহলে অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তার ব্যাপারটি আসলে কখন ঘটে? একদম সুস্পষ্ট করে বললে, আমরা যখন কোনো বিষয় নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত, কল্পনাতীত ও সীমাহীন চিন্তা করতে থাকি, তখনই সেটি 'অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা'। আর এটাই মানুষের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। এটা আমাদের ভালো কিছু দিতে পারে না।

চিন্তাভাবনা একটি সুন্দর সক্ষমতা। এটি সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে আমাদের

জন্য একটি উপহার। চিন্তাভাবনাকে ইতিবাচক উপায়ে কাজে লাগিয়ে একজন মানুষ নিজের সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে। আবার চিন্তাভাবনার অপব্যবহার করেই যেকোনো মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আমাদের চিন্তাভাবনা আমাদের সফলতার নিয়ামক। এটি কখনোই আমাদের শত্রু নয়। কিন্তু তা কখন? যখন আমরা অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা বন্ধ করব, তখন। অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা করলে চিন্তাভাবনার ক্ষমতা নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না।

মানসিক চাপ ও যন্ত্রণার কারণ

যদি মস্তিষ্ক এমন চমৎকার একটি থিংকিং টুলসই হবে, তাহলে কেন অতি সহজেই মানুষ অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তার মতো নেতিবাচক অবস্থায় পড়ে যায়? সমস্যাটা আসলে কোথায়? কোন কারণে মানুষ নিজেকে দিনের পর দিন অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত রাখে? যদিও তারা নিজেরাও চায় না এমন অবস্থায় থাকতে? এই প্রশ্নগুলো ঘুরেফিরেই সবার মনে আসে, আসা উচিত বলেই মনে করি। এসব প্রশ্নের বিপরীতে যুগের পর যুগ ধরে মানুষ, বিশেষ করে যারা অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা করে, নিজেদের থিওরি শেয়ার করে এসেছে। তাদের মতে, অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা একটি অভ্যাস, অথবা এটি একটি ব্যক্তিগত আচরণবিধি, অথবা একটি রোগ, যা পর্যাপ্ত চিকিৎসা নেওয়ার দ্বারা দূর করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, অনেক মানুষই আছে, যারা তাদের প্রিয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে দিনের পর দিন। আর এটাই তাদেরকে অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তার দিকে নিয়ে যায়। অনেকে আবার অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা নিয়ে এতই ত্যক্তবিরক্ত হয়ে যায় যে, চিৎকার করে নিজেকে বলে, 'কেন, কেন, আমি এমন কেন!'

এ ধরনের অবস্থা থেকে একজন ব্যক্তি নিজেকে আর সহজে বের করতে পারে না। ফলে জীবনপথে তার এগিয়ে চলা বেশ সমস্যাজনক হয়ে দাঁড়ায়। আপনি যদি এমন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন এবং এখান থেকে মুক্তিলাভের জন্য বইটি হাতে নিয়ে থাকেন, তাহলে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনাকে হতাশা আর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতেই মূলত বইটি লেখা হয়েছে। অবশ্যই এসব সমস্যার সমাধান রয়েছে। বেশ সহজ, পানির মতো উপায়ে নিজেকে দুশ্চিন্তা থেকে বের করার পদ্ধতি রয়েছে, যা ব্যবহার

ডি স্ট্রেস ফরমুলা এবং অন্যান্য

আমাদের ডি স্ট্রেস ফরমুলার কাজ হচ্ছে দুশ্চিন্তা করার সময় আমাদের মাথায় চলতে থাকা সব বিষয় পরিপূর্ণভাবে খুঁজে বের করা এবং সেসবের সমাধান নিশ্চিত করা। দুশ্চিন্তা করার ক্ষেত্রে মস্তিষ্ককে সবসময়ই কিছু বিষয় ট্রিগার করে থাকে। এই ট্রিগারকে শনাক্ত করতে হবে, যাতে সমস্যা থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি যখন আমি আপনার সামনে উন্মুক্ত করব, তখনই আপনার পক্ষে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে জরুরি স্টার্টিং পয়েন্ট কোনটি? সচেতনতা। হ্যাঁ, সচেতনতাকে অবলম্বন করেই শুরুতে কাজ করতে হবে আপনাকে।

এই অধ্যায়ে আমরা অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা ও উদ্‌বেগ থেকে নিজেদের রক্ষা করার বেসিক নিয়ে আলোচনা করব। এই বেসিক ফ্যাক্টের সাহায্যেই নিজেকে একটা ভালো জায়গায় নেওয়া সম্ভব হবে আপনার পক্ষে। এখন কথা হচ্ছে, এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সচেতনতাই আমাদের অবলম্বন। সচেতনতা কোনো স্মৃতি রোমন্থনের ব্যাপার নয়, বরং এটি আমাদেরকে যেকোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে মনোযোগী হতে সাহায্য করে। এটি আপনাকে আরও সাহায্য করে থাকে নিজের ব্যাপারে জাজমেন্টাল না হয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে। আপনি যদি নিজেকে অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করতে চান, তাহলে শুরুতেই আপনাকে জাজমেন্টাল হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। জাজমেন্টাল পজিশন কখনোই আপনাকে আপনার সমস্যা বুঝতে দেবে না। সুতরাং সচেতন থাকার মানেই হচ্ছে নিউট্রাল হয়ে নিজের সমস্যাকে উপলব্ধি করে সেই অনুসারে সমাধানের দিকে আগানো।

একজন অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা ও উদ্‌বেগ নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষ হিসেবে দিনশেষে আপনি ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। আপনার হাতে প্রচুর কাজ, কিন্তু করতে ইচ্ছা করছে না। আপনার বস আপনার ওপর অসন্তুষ্ট, কারণ ঠিকমতো সকল কাজ জমা দিতে পারছেন না। সকাল সকাল আপনার মিটিং রয়েছে, কিন্তু সেই

আপনার টাইম ম্যানেজ করুন

সুশিকে আজ অনেক কাজ করতে হবে। তাই সে নিজের ওয়ার্ক শিডিউলের দিকে নজর দিলো। শিডিউল ঠিকমতো দেখতেই বিস্মিত হয়ে গেল সে। এত কাজ আজকের দিনে কীভাবে করা সম্ভব! মনে মনে ভাবল সুশি। সুশিকে এভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখে তার সহকর্মী এগিয়ে এলো এবং সাজেশন দিলো লাঞ্চ ব্রেকের সময় পাঁচ মিনিট মেডিটেশন করার জন্য। মেডিটেশন মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে, তাই না? কিন্তু মেডিটেশনের পরামর্শও সুশির মনমতো হলো না। পাঁচ মিনিটের মেডিটেশনের সময় তার ভেতরে অস্থিরতাই ছিল এবং পাঁচ মিনিট শেষ হওয়ার পর তার হাতে সময় আরও অল্প ছিল। মেডিটেশনের পুরোটা সময় জুড়ে তার মাথায় কেবল দুইটা ত্রিশ মিনিটে থাকা অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাই আসছিল।

যখন আপনার টাইম ম্যানেজমেন্ট ঠিকঠাক থাকবে না, তখন ক্লাসিক রিল্যাক্সেশন কখনোই ভালো সমাধান হতে পারে না। আপনার নিজের সময় শিডিউলই উলটাপালটা হয়ে আছে, সেখানে মেডিটেশন করে কীভাবে নিজেকে ঠিক রাখবেন? রাখা সম্ভব নয়। এই কারণে নিজের টাইম ম্যানেজমেন্টের দিকে সবসময়ই খেয়াল রাখতে হবে। সুশির সমস্যা সমাধানে মেডিটেশন কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়। সে যদি নিজের টাইম শিডিউল এক ঘণ্টা বেশি করে নিতে পারত অথবা আগামীকালের জন্য নতুন করে শিডিউল ঠিক করতে পারত, তাহলেই বরং আরও বেশি ভালো হতো তার জন্য। মেডিটেশন আমাদের তখনই ভালো রাখতে সক্ষম, যখন আমাদের ভেতরে চরমতম অস্থিরতাকে জয় করার অপশন থাকে। অথবা আমাদের হাতে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের নতুন কোনো অপশন না থাকে। যাই হোক, টাইম ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে অস্থিরতা দূর করার কাজে সহায়তা করতে পারে। এই চ্যাপ্টারে আমি আপনাকে নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ব্যাপারেই জানাব।